The Dhaka University Journal of Linguistics : Vol. 7 & 8, No. 13-16, Publication date: February 2016, Publishers: Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

বৈষ্ণব পদাবলির ভাষা : ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিপাত

সানৃজীদা মাসুদ*

Abstract: The main focus of this article is to analyze the grammatical and semiotic attributes of the language of *Boishnob Padaboli*, a sublime branch of medival Bangla literature. This paper tries to illustrate its proposition chiefly into two parts. In the first part textual analysis of its relevant grammatical properties has been presented briefly. The second part of this paper is accomplished with the semiotic analysis to find the connotative uniqeness of *Padaboli* texts. The distinguished narratives of eminant poets with boishnob traditions, their philosophy towards life and especially their trancendent creativity have been observed and discussed in this paper to understand how these elements influenced the grammatical properties of *Padaboli* texts.

১. ভূমিকা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমত ও দর্শনের সঙ্গে মানবীয় চেতনার বহুবিচিত্র রং-রূপের সংশ্লেষে প্রণীত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলির রসময় জগৎ। তবে, তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টিতে ভিন্নমত পোষণের সুযোগ থাকলেও, রসজ্ঞের ব্যাখ্যায় এ-অভিমতই প্রাধান্য পায় যে, মহাজনপদকর্তাদের রূপায়ণে বরং বড় হয়ে উঠেছিল মানবীয় সম্পর্ক ও প্রেমগাথার চিরন্তন অনুভূতি। পদাবলির উদ্ভব ও পরিণতি সাধিত হয় মধ্যযুগে। সমসময়ে যুগপৎ বিকশিত হয় বাংলা ভাষাও। তাই মধ্যযুগের বাংলা ভাষার গতি-প্রকৃতি বিবেচনায় *পদাবলি সাহিত্য* অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের বৈষ্ণব পদাবলির অনুকরণে বা সাদৃশ্যে শাক্ত পাদাবলি ও বাউল রচিত হয়। এ দুই ধারার পদাবলিই লোকগ্রাহ্যতা অর্জন করে। বর্তমান প্রবন্ধে *বৈষ্ণব পদাবলি*র ভাষা বিশ্লেষণেই আমাদের দৃষ্টি ও মনোযোগ নিবদ্ধ থাকবে। পদাবলি সাহিত্য রচনার কালে কীভাবে উচ্চারিত হতো এর ধ্বনি ও ধ্বনিসংবলিত শব্দ ও শব্দাবলি, সে-সম্পর্কিত কোনো উপাত্ত সংগ্রহের সুযোগ নেই। ফলে, এই সাহিত্য-সংরূপের ধ্বনিবিষয়ক আলোচনা স্বল্প পরিসরেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে পদাবলির

---

* লেকচারার, বাংলা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

লিখিত পাঠ অনুসরণ করে এর ব্যাকরণিক তথা রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যতাত্ত্বিক বিবেচনা সম্ভব। আবার এ কথাও স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, পদাবলির সৃজনে বহু কবির কাব্য প্রয়াস বিজড়িত। ফলে, পদাবলির ভাষা অনুসরণ করে মধ্যযুগের বাংলা ভাষার কালকেন্দ্রিক (synchronic) বিবেচনার সুযোগ থাকলেও এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কবিদের ব্যক্তিভাষা (idiolect) এবং ডিসকোর্স-এর বিষয়টির প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে বর্তমান প্রবন্ধে পদাবলির পাঠ অনুসরণ করে মধ্যযুগের বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের প্রয়াস গ্রহণ করা হবে; একইসঙ্গে, পদাবলি সাহিত্যে অভিব্যক্ত রসাবেদন এবং ভাবসম্পদের যে বাগর্থতাত্ত্বিক তাৎপর্য রয়েছে তা এই সাহিত্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন চিহ্নের (sign) বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিরূপণ করা হবে। অর্থাৎ, বৈষ্ণব পদসমূহের ভাষার ব্যাকরণিক ও চিহ্ন-সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও বিবেচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পদাবলি সাহিত্যের সামান্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে লক্ষ করা যায় যে, একটি বিশেষ বিষয় অবলম্বনে করে এতে অসংখ্য কবি স্বকীয়তার সঙ্গে কাব্যচর্চায় সচেষ্ট হয়ে ছিলেন। বাখতিনের ভাষায় বহুস্বরিক (poliphonic) বোধের একটা প্রাথমিক আয়োজনের আভাস লক্ষ করা গেছে এই শ্রেণির সাহিত্যে। তত্ত্ব ব্যাখ্যায় কিংবা দর্শনে কবিদের অবস্থান যাই হোক না কেন, মৌল শিল্প-প্রবণতায় তাঁরা ছিলেন সবিশেষভাবে নিবেদিতপ্রাণ। মানবীয় সম্পর্ক, প্রেমভাব ও প্রেমজ বিরহবোধের উন্মোচনই তাঁদের ভাবনা জগতের শিখরদেশে স্থিতি পেয়েছে। বিরহী আত্মার গভীরতর ক্রন্দনের নান্দনিক সৌন্দর্যকেই শিল্পবোধের মূল আয়ুধ হিসেবে গ্রহণ করলেন তাঁরা। ফলে পদাবলি সাহিত্য বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব, বাঙালি-অবাঙালি সর্বোপরি, নির্বিশেষ রসজ্ঞ ও ভোক্তার আগ্রহের বিষয়ে পরিণত হয়। প্রেমবোধ ও প্রেমজাত বিরহদর্শন পদাবলিকে কালোত্তীর্ণ দ্যোতনা এনে দেয়। এসবের পাশাপাশি ভাষাগত বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা এর চিরায়ত মূল্যমানের আরেকটি কারণ। কেননা 'কবি যখন কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন তিনি তখনই বোঝেন যে সৃষ্টির উৎসস্থলই ভাষা, তাঁর রচিত কাব্যটি যতটা তাঁর ঠিক ততটাই তাঁর ভাষার সৃষ্টি ...(বুদ্ধদেব ২০১৪ : ৪৪২)। এ বিষয়ে দেরিদার অভিমত–'শব্দই ব্রহ্ম, শব্দই সমস্ত অর্থ ধারণ করে এবং বস্তুসম্পর্কিত ধারণা শব্দের মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়। ভাষা সব অর্থই ধারণ করে, কোনো কিছুর অর্থ পেতে তাই সমস্যা হয় না' (সূত্র: বেগম আকতার ২০১৪ : ৩৫৭)। পদকর্তাগণ এমনই লাবণ্যময়, মোহনীয়, পরিচ্ছন্ন ও ভাব-প্রকাশোপযোগী অপেক্ষাকৃত সরল ভাষারীতিতে কৃষ্ণলীলা ও রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা লিপিবদ্ধ করলেন যে, সেকাল ও একাল – উভয় সময় পরিসরে পদাবলির সর্বস্তরপ্লাবী চিরকালীন আবেদন লক্ষণীয়। মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলে অবস্থান করেও ভাষা বিষয়ে কবিদের সচেতনতা, পরিপক্বতা ও দক্ষতা অবশ্য প্রশংসনীয়। পদাবলির ভাষা তাই একটি আকর্ষণীয় অনুষঙ্গ, যা নিয়ে সুচিন্তিত বিবেচনার অবকাশ রয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলির ভাষা বিষয়ে গভীর অভিনিবেশ বর্তমান প্রবন্ধের মূল প্রেরণা।

২. পদাবলির পরিচয়

সুবিশাল কাব্য-ঐশ্বর্য নিয়ে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সংযোজিত হলো *বৈষ্ণব পদাবলি*। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* (১৯১৬)-এর পরবর্তী ধারা বৈষ্ণব পদাবলি। দুটি সাহিত্যধারাই বাংলা সাহিত্যে অমলিন, অম্লান; এমনকি অবলম্বিত বিষয়ও প্রায় অনুরূপ : কৃষ্ণলীলা ও রাধাকৃষ্ণ-লীলা। তবে এর মূল পার্থক্য হলো বিষয়ের বিন্যাস কৌশলে : পদাবলিতে বৈষ্ণব কবিরা ধর্মদর্শন ও কাব্যভাবনার চমৎকার সমন্বয় সাধনে পারঙ্গমতার পরিচয় দেন। গীতিকবিতার স্বল্পায়তনিক ফর্মে উদ্ভাসিত হলো বৈষ্ণবীয় চিন্তাচেতনার টুকরো টুকরো ভাবৈশ্বর্য; ব্যক্তিমানসের আবেগ মিশ্রিত কৃষ্ণকথা ও রাধাকৃষ্ণ সমাচার প্রকাশ পেল সংক্ষিপ্ত, সংহত অথচ লিরিক্যাল ভঙ্গিমায়। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-শৈশব-কৈশোর-যৌবনের পুরো ব্যাপারটি *বৈষ্ণব পদাবলি*তে উঠে এসেছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর প্রভৃতি রসের আধারে কবিরা জীবাত্মা-পরমাত্মার তাত্ত্বিক ও দার্শনিক দিক উন্মোচন করেন। এখানে রাধা একই সঙ্গে প্রণয়িনী ও জীবাত্মা। রাধা পরমাত্মার শরীরেরই অংশবিশেষ। পরমাত্মা থেকে একবার বিচ্ছিন্ন হলে পুনরায় মিলন সম্ভব নয়। কিন্তু রাধা পরমাত্মায় বিলীন হতে চায় বারংবার, কিন্তু ব্যর্থ হয়। ভূমিষ্ট শিশু যেমন মাতৃগর্ভে ফিরে যেতে পারে না, তেমনি কৃষ্ণ-শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন রাধার পক্ষেও কৃষ্ণসত্তায় লীন হওয়া সম্ভব নয়। একইভাবে যশোদা, ছিদাম, সুদাম, বলরাম, এমনকি গোপাঙ্গনারাও মহান সত্তা কৃষ্ণের বিপরীতে জীবাত্মা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে বৈষ্ণব পদে। বন্ধু হয়ে, দাস হয়ে, সখি হয়ে তারা কৃষ্ণ-সাহচার্যের জন্যে ব্যাকুল। যশোদার কৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রতিপালন, পরিচর্যা, ভালোবাসা এবং খুঁনসুটির মধ্যে মাতা-পুত্রের মধ্যে সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতা নিরসনের একটা সূক্ষ্ম প্রয়াস লক্ষ করা গেল। এভাবে মানব সম্পর্কের নানা মাত্রা বৈষ্ণবীয় পঞ্চরসের আধারে রসমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। আর সর্বরসের আধার কৃষ্ণ ভক্তের ভালোবাসায় সিঞ্চিত হলেন; ঘুচে গেল ভক্ত ও ভগবানের ভেদরেখা। অপার্থিব পরম সত্তার প্রতি এই প্রেম শেষপর্যন্ত দেবতার প্রেম হয়ে থাকেনি; পার্থিব নরনারীর মর্মস্পর্শী প্রেমানুভূতির আখ্যানের মর্যাদা লাভ করেছে। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা' ("বৈষ্ণব কবিতা", *সোনার তরী*)-এর মতন।

*বৈষ্ণব পদাবলি*র প্রতিটি কবিতা কবির এক একটি মনোভাবনার ইঙ্গিতবহ। কবিরা বর্ণনা, বিবৃতি, চিত্রময়তা প্রভৃতির পরতে পরতে খণ্ড খণ্ড অনুভাবনা যোজিত করেন বিশিষ্ট ভাষাবয়নরীতিতে। বৈষ্ণব পদাবলির ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি বিদ্যাপতির নাম মিশে গেছে। বৈচিত্র্যসন্ধানী ও সৌন্দর্যপিপাসু এই কবির ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলংকার, চিত্রময়তা প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্য অস্বীকারের উপায় নেই। তাঁর পরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উঠে আসে শ্রীচৈতন্যদেবের নাম। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর উদার প্রেমধর্মে সর্বশ্রেণির মানুষকে প্রেমভক্তির পতাকাতলে ঠাঁই দিয়েছিলেন। সকলেই তাঁর তত্ত্বকথা ও দর্শনের সংস্পর্শে এসে নবজীবন চেতনায় উদ্দীপিত হয়েছিল। ফলে বিশেষের সীমা অতিক্রম করে তত্ত্ব, দর্শন, বিশ্বাস ও বিশিষ্ট

চেতনা হলো নির্বিশেষের। সে-কারণে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের ভাষায় আশ্রয় খুঁজে নিল বৈষ্ণব কবিতা। পদাবলির ভাষার প্রাথমিক রূপ লক্ষ করা যায় *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* অপেক্ষাকৃত প্রাচীন হওয়ায় এতে ভাষার অনেক পুরনো রূপ সংরক্ষিত রয়েছে। তবে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর ভাষার বৈচিত্র্য কম, প্রায়শই একই রকমের ভাষা লক্ষ করা যায়। কিন্তু পদবালির ভাষায় রকমফের দেখা যায় : কবিভেদে এবং সময় প্রতিবেশের প্রভাবে তা বিভিন্ন রূপ লাভ করেছে। পদাবলিতে তাই সমন্বিত হলো বাংলা, সংস্কৃত, আরবি-ফারসি, মৈথিলি বা ব্রজবুলি ভাষার বিবিধ রূপ। পদাবলির প্রধান চার কবিপ্রতিভার মধ্যে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস মৈথিলি বা ব্রজবুলিতে; চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস খাঁটি বাংলা ভাষায় নিজস্ব কবিভাষারীতি অনুসরণ করে পদ রচনায় সামর্থ্যের পরিচয় দেন। হুমায়ুন আজাদ (বা. ১৪১৬) যথার্থই বলেছেন — 'ভাষার ওপর তাঁদের অধিকার ছিলো বিধাতার মতো; তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন বাঙলা ভাষার সে-সব শব্দ, যা মনোহর, মায়াবী, স্বপ্নের মতো। ... তাঁরা যখন উপমা দেন মনে হয় এ-রকম আর হয় না; তাঁরা যখন হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেন তাতে আমরা আবেগাতুর হয়ে পড়ি' (পৃ. ৩৫)। প্রায় পুরো মধ্যযুগ ধরে রচিত হওয়ায় আদি-মধ্যযুগের (আনু: ১৩৫০-১৫০০) ও অন্ত্য-মধ্যযুগের (আনু: ১৫০০-১৭৬০) ভাষার বহুবিধ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে এই সাহিত্য সংরূপ। কালগত বিবেচনায় বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস আদি-মধ্যযুগের আর জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস অন্ত্য-মধ্যযুগের কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়েছেন। ফলে তাঁদের কবিতায় ওই সময়ের ভাষাবৈজ্ঞানিক উপাদান নিহিত রয়েছে — এরূপ অনুকল্প গ্রহণ অযৌক্তিক নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিক মধ্য-মধ্যযুগ বলে একটি সময়ের কথা বলেছেন। সাহিত্য রচনার দিক থেকে উল্লিখিত সময়পর্বটির যতখানি স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করা সম্ভব, ভাষা পরিবর্তনের দিক থেকে তার গুরুত্ব কতখানি – তা নিয়ে গভীরতর বিবেচনা প্রয়োজন। বর্তমান প্রবন্ধের পরিসর সীমিত হওয়ায় অধিকতর প্রচলিত আদি-মধ্যযুগ ও অন্ত্য-মধ্যযুগের বিষয়টি বিবেচনায় থাকবে।

৩. বৈষ্ণব পদাবলির ভাষার ব্যাকরণিক কাঠামো

৩.১ *আদি-মধ্যযুগের পদাবলির ধ্বনিবৈশিষ্ট্য*

ক. ধ্বনিবিন্যাসের ক্ষেত্রে পদাবলির কবিরা কেবল সচেতনই ছিলেন না, একইসঙ্গে এর যথাযথ প্রয়োগে তাঁরা ছিলেন যথেষ্ট সাবলীল ও স্বাতন্ত্র্যসন্ধানী। পদাবলি সাহিত্যে সুরের বিশেষ প্রাধান্য থাকায় কবিরা সুরের দাবি মেটাতে গীতবাণী সৃজনে স্বরধ্বনি-প্রধান শব্দচয়নের প্রতি আগ্রহী হলেন বেশি। এতে পদাবলিসমূহে ব্যঞ্জনধ্বনি অপেক্ষা স্বরধ্বনির ব্যবহারের প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়। বস্তুত, গীতের উদ্দেশ্যে রচিত এসব পদ-মধ্যে কোমল, নরম ভাবের সুরের প্রতিবেশ নির্মিতিতে স্বরধ্বনির ব্যবহার অত্যন্ত আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। গীতময়তাকে আরো নিবিড় ও সরল করবার প্রয়াসে দীর্ঘ স্বরের চেয়ে হ্রস্ব স্বরের

প্রতি কবিরা অধিক মনোযোগী হলেন। পদাবলির প্রায় প্রতিটি কবিতায় এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যাবে। —

সই, কেমনে ধরিব হিয়া
আমার বধুঁয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া।
[মান বিষয়ক পদ, চণ্ডীদাসঃ ১৯০] (হাই ও শরীফ : ২০১৩)

রাধার অন্তর্দেশ-বাহিত একরাশ অভিমান ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে ধ্বনিবিন্যাসের তারল্যে ও লালিত্যে। রাধার সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় অভিমান যেন বিগলিত হয়ে ভূমিতলে গড়িয়ে যাচ্ছে, প্রবাহিত হচ্ছে যেন যুগ থেকে যুগান্তরে, ব্যক্তিহৃদয় থেকে বিশ্বমানবের হৃদয়দ্বারে। আর এর ভিত্তি ধ্বনিবিন্যাসের এলায়িত ভঙ্গি; যা শেষপর্যন্ত এক অত্যুচ্চ সুরলহরীর অভিমুখী।

খ. মধ্যযুগে ব্যবহৃত পদাবলির ধ্বনি-উচ্চারণ-প্রক্রিয়ার কোনো প্রামাণ্য নিদর্শন মেলেনি আজও। আদি-মধ্যবাংলার সম্ভাব্য উচ্চারণরীতির আলোকেই পদাবলির ধ্বনি-উচ্চারণ নির্ণীত হবে এখানে। আদি-মধ্যবাংলার একটি বৈশিষ্ট্য হলো 'অ'-ধ্বনির উচ্চারণ। শব্দের আদিতে 'অ'-কার থাকলে তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'আ'-তে রূপান্তরিত হয়। ধ্বনি-উচ্চারণের সূত্র অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

প্রদত্ত শব্দ	ভাষিক সূত্র	IPA̭
অন্তর (পদসংখ্যা ১০০)	আন্তর	an̪tor
অনল (পদসংখ্যা ১১৪)	আনল	anol

এছাড়াও, পদাবলির ধ্বনিব্যবস্থায় 'শ', 'ষ', 'স'– এই তিনটি ধ্বনির উচ্চারণ ছিল প্রায় একই রকমের, অনেকটা 'স' অর্থাৎ ইংরেজি 's' এর মতো। ন/ণ এবং জ/য এর উচ্চারণ ও ব্যবহারেও এ প্রবণতা দেখা গেছে। বাংলা ভাষার ইতিহাস বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, মহাপ্রাণ ধ্বনির (হ্ম, হ্ন, ঢ়, হ) প্রাচুর্য ও এসব ধ্বনির নাসিক্য উচ্চারণ প্রবণতা ছিল। এছাড়া ধ্বনিসমূহে আনুনাসিকতা আরোপের প্রবণতা দুনিরীক্ষ্য নয়। দুই যুক্তব্যঞ্জনের একটির লোপ পদাবলিতেও দেখা যায়: নিচয় > নিশ্চয়, নিলজ > নিলজ্জ, নিঠুর > নিষ্ঠুর। তাছাড়া দুই ব্যঞ্জনের মাঝখানে স্বরের আগমন (ব্যাকরণের ভাষায় যাকে বলে বিপ্রকর্ষ) এর অন্যতম বিশিষ্টতা, যা পদাবলির ভাষায় লক্ষ করা গেছে। যেমন : 'দরশনে' (পদসংখ্যা ৪৭), 'অলপ' (পদসংখ্যা ৬৫), 'সিনেহ' (পদসংখ্যা ২৭৪) প্রভৃতি। একটি স্বরের প্রভাবে আরেকটি স্বরের পরিবর্তন আধুনিক ভাষাপরিবর্তনের একটি রীতি, যা পদাবলির ভাষায়ও পরিলক্ষিত হয়। এ বৈশিষ্ট্য কবিভাষাকে একই সঙ্গে সারল্য, মাধুর্য ও কাব্যিকতা প্রদান করেছে।

৩.২ *আদি-মধ্যযুগের পদাবলির রূপবৈশিষ্ট্য*

ক. মধ্যভারতীয় থেকে নব্যভারতীয় আর্য পর্যায়ে উত্তরণের কালে ভারতীয় বিভিন্ন

ভাষায় ব্যাকরণিক লিঙ্গ (grammatical gender) ব্যবহৃত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা গেলেও প্রাচীন বাংলা থেকেই এর নিয়মিত ব্যবহার দেখা যায় না। মধ্যযুগে এই ব্যাকরণিক লিঙ্গ ব্যবহারের প্রবণতা আরো হ্রাস পায়। তবে ভাষা বিগঠনের এই কালে সীমিত পর্যায়ে এর ব্যবহার ছিল। প্রসঙ্গক্রমে বৈষ্ণব পদাবলির ভাষাতেও স্বল্প পরিসরে ব্যাকরণিক লিঙ্গের প্রয়োগ শনাক্ত করা যেতে পারে। এর ক্রিয়া অংশে এমন কিছু প্রত্যয় ব্যবহৃত হতো যা লিঙ্গ বিভেদ নির্দেশে সহায়ক ভূমিকা রাখত। বিশেষত '-ই' প্রত্যয়ের সংযোগ নারীবাচক অর্থ নির্দেশ করত; যেমন:

প্রদত্ত শব্দ	ভাষিক সূত্র
ভেলি (পদসংখ্যা ৪৭, ২৭৫)	ভেল+ই (হইল অর্থে) [ধনি-মন্দির বাহির ভেলি]
গেলি (পদসংখ্যা ৪৭, ৯৩)	গেল+ই (যাওয়া অর্থে) [গেলি কামিনি গজহু গামিনি]
বৈঠবি (পদসংখ্যা ১৬৮)	বৈঠব+ই (বসা অর্থে) [পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম]

খ. প্রত্যয়ের ব্যবহার অনেকাংশেই প্রাচীন বাংলার অনুগামী: '-ইবাম', '-ইলো' প্রত্যয়ের প্রয়োগের প্রাচুর্য রয়েছে বৈষ্ণব পদে। কর্তৃবাচ্যে '-ইলো' প্রত্যয় অতীত, অর্থ জ্ঞাপন করত; দৃষ্টান্তস্বরূপ– 'গাইল চণ্ডীদাস'।

গ. যৌগিক ক্রিয়ার বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করা যাবে এ পর্যায়ে। সিনান করি (পদসংখ্যা ২৯০), জুড়ন না গেল (পদসংখ্যা ২৯১), মিনতি করি (পদসংখ্যা ২৯৮) সহ নানা যৌগিক ক্রিয়ার উপস্থিতি বৈচিত্র্য ও নান্দনিকতারই স্মারক।

ঘ. পদাবলির ভাষায় সর্বনামের প্রয়োগ বাহুল্য দেখা যায়। সর্বনামের প্রাচীন ও আধুনিক উভয় ধারার সর্বনাম রূপ লক্ষ করা গেছে। 'আহ্মার', 'তোহ্মার'– এর পাশাপাশি 'আমার' (পদসংখ্যা ২৬২, ২৮৭) 'মোর' (পদসংখ্যা ১৯৪), 'মুঞি' (পদসংখ্যা ৬০, ১২৮), 'আমি' (পদসংখ্যা ২৬৯, ২৭৯), 'তোর' (পদসংখ্যা ২৬৫, ২৯০) ইত্যাদি আধুনিক রূপের প্রয়োগ দেখা গেছে।

ঙ. পদাবলির সবচেয়ে উৎকর্ষের দিক এর শাব্দিক ক্ষেত্র। বাংলা, সংস্কৃত, ব্রজবুলি, অবহট্‌ঠ, অপভ্রংশ, প্রাকৃত ভাষার বিকাশ সাধিত হচ্ছিল প্রায় একই সময়ে। সঙ্গত কারণেই বাংলা ভাষা অন্য ভাষার শব্দভাণ্ডার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ফলে *বৈষ্ণব পদাবলির* ভাষায়ও এসেছে বিচিত্রতা। নিচে উদ্ধৃত পদটি দেখা যাক—

এক তুয়া তুয়া করি তেজয়ে পরাণ।
বড়কা প্রেম বড়হি এক জান॥
বিদ্যাপতি কহে প্রেম অগেয়ান।
তনু সঙ্গে পরবশ করত পরাণ॥
[অনুরাগ বিষয়ক পদ, বিদ্যাপতি: পদসংখ্যা ৯৮]

'অজ্ঞান' 'প্রাণ' শব্দদ্বয়ের তরল রূপ যথাক্রমে 'পরাণ', 'অগেয়ান' যে ভাবব্যঞ্জনা তৈরি করছে — মূল শব্দের প্রয়োগে তা সম্ভব হতো না। যুক্তব্যঞ্জনের সহজীকরণ-সূত্রে শব্দের অ-কঠিন অবয়বে রাধার কৃষ্ণ-অনুরাগ পরম শৈল্পিক অভিব্যঞ্জনায় রূপান্বিত হলো। আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগও এর ভাষাকে প্রাঞ্জল ও শিল্পান্বিত করেছে। —

১. অবলি শাঙলি 'আও-রি আও-রি'
ফুকরি চলত কান-রি।
[শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক পদ, নাসির মাহমুদ : ১৭]

২. খোস না লাগে মোর গৃহের বেভার
রাজপন্থে ননদিয়া দিছে আঁখি-ঠার॥
[অনুরাগ বিষয়ক পদ, সৈয়দ আইনুদ্দিন : ৩২]

৩. রাজপন্থে থাক কানু রে করো বাটোয়ারি।
ছাড়ি দেও নেতের অঞ্চল বন্ধু ভাঙ্গিব গাগরী॥
[বংশী বিষয়ক পদ, সৈয়দ মর্তুজা : ১০৭

উল্লিখিত উদ্ধৃতির 'ফুকরি', 'খোস', 'বাটোয়ারি' প্রভৃতি মধ্যপ্রাচীয় শব্দ বৈষ্ণব পদের শাব্দিক ক্ষেত্রকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তাছাড়া পদাবলিতে এমন কিছু বিশিষ্টার্থক শব্দের ব্যবহার রয়েছে যেগুলো বর্তমানে আমাদের শব্দকোষে অনুপস্থিত : 'নেহা' (প্রেম অর্থে) 'কাহ্ন' (কৃষ্ণ অর্থে), 'পাসরিতে' (ভুলতে পারা অর্থে), 'তুয়া' (তোমাকে বোঝাতে) প্রভৃতি।

চ. বাংলা ভাষার নিজস্ব নিয়মে নানাভাবে শব্দ গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় : উপসর্গ-প্রত্যয় যোগে, সন্ধি-সমাসের মিলনে। ভাষার এ বৈশিষ্ট্যটি বৈষ্ণব পদাবলির কোনো কোনো পদে শনাক্ত করা যায়। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার ও প্রত্যয় পদাবলির শব্দগঠন প্রক্রিয়াকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত —

প্রদত্ত শব্দ	ভাষিক সূত্র
ধরই (পদসংখ্যা ৪১)	< সং √ধৃ+ক্ত > ধৃত > ধরিত > ধর
হেরইতে (পদসংখ্যা ৪১)	√হের্ + ইতে > হেরইতে > হেরিতে
চললি (পদসংখ্যা ৪৮)	< চিল্ +ক্ত =চলিত + ইল্ল > চলিল্লঅ > চলিলা > চললি
জুড়াএব (পদসংখ্যা ৯৩)	√জুড় +এ = জুড়াএব > জুড়াইব> জুড়াবে
হাসিতে (পদসংখ্যা ১১৪)	√হাস্ + ইতে = হাসিতে > হাসতে
সাজিয়া (পদসংখ্যা ১৭২)	√সাজ + ইয়া = সাজিয়া > সেজে

উপসর্গের দৃষ্টান্ত :

প্রদত্ত শব্দ	ভাষিক সূত্র
অসতী (পদসংখ্যা ৩০৮)	অ + সতী
সুমেরু (পদসংখ্যা ২৯৩)	সু + মেরু
অনুদিন (পদসংখ্যা ২৭৫)	অনু + দিন
আকুল (পদসংখ্যা ১০০)	আ + কুল
কূজন (পদসংখ্যা ১১৬)	কূ + জন

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে, খাঁটি বাংলা ভাষায় পদ রচনায় চণ্ডীদাসের সাফল্য অবিসংবাদিত। তিনি এমনভাবেই শব্দ নির্বাচন করেন, যা পাঠককে এক সুরেলা ভুবনে নিয়ে যায়। —

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥

[আত্মনিবেদন বিষয়ক পদ, চণ্ডীদাস: পদসংখ্যা ৩০৮]

অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগে (বলিয়া, লাগিয়া, পরিতে) বাক্যের মধ্যে এক ধরনের ছন্দময়তা গড়ে ওঠে। কৃষ্ণের প্রতি রাধার সর্বস্ব সমর্পণের এক অনিঃশেষ বারতা পাঠককে কবি জানান দিলেন বাক্য-মধ্যে অন্তঃশীলা সেই অসমাপ্য ছন্দদোলা ব্যবহার করে।

৩.৩ *আদি-মধ্যবাংলার পদাবলির বাক্যিক বৈশিষ্ট্য*

ক. আধুনিক বাংলা ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বাক্যের বিচিত্র বিন্যাস। এ ভাষার এ লক্ষণ পদাবলিতে বজায় রয়েছে। তবে কবিতার পদক্রম বিন্যাসে কবিরা একটু অতিরিক্ত স্বাধীনতা পান, যা সাহিত্যের অন্যান্য ধারায় সচরাচর ঘটে না। বৈষ্ণব কবিরাও পদবিন্যাসে স্বাধীনতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। পদক্রমের প্রচলিত ব্যাকরণিক ফর্ম ভেঙে কবিত্ব শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে তাঁরা ছিলেন বিশেষভাবে পারঙ্গম। শিল্পবোধের সুতীব্র তাগিদ থেকেই আবেগ-অনুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশরীতির স্বার্থে পদক্রমের অদল-বদল করেন বৈষ্ণব কবিরা। বাংলা ভাষার সাধারণ বাক্য গঠন প্রক্রিয়ায় দেখা যায় যে, বাক্যের শুরুতে কর্তা, মাঝখানে কর্ম এবং শেষে ক্রিয়ার অবস্থান। প্রচলিত ও পরিচিত এ কাঠামো ভেঙে তাঁরা বাক্যবিন্যাসে (Syntax) নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন —

১. বধুঁ কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
[আত্মনিবেদন বিষয়ক পদ, চণ্ডীদাস:
পদসংখ্যা ৩০৯]

২. সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
[অনুরাগ বিষয়ক পদ, দ্বিজ চণ্ডীদাস:
পদসংখ্যা ৫৭]

৩. নব অনুরাগিনি রাধা।
কছু নাহি মানএ বাধা॥
একলি কএল পয়ান।
পথ বিপথ নহি মানা॥...
মণিময় মঞ্জির পায়।
দূরহি তেজি চলি যায়॥
[অভিসার বিষয়ক পদ, বিদ্যাপতি:
পদসংখ্যা ১৪৫]

খ. পদাবলিতে বাংলা, সংস্কৃত, মৈথিলি বাক্‌রীতি এক স্বচ্ছন্দ অঙ্গে পরিণত হয়েছে। ভিন্ন ভাষার বাক্য গড়ন প্রক্রিয়াও পদাবলির অঙ্গসৌষ্ঠবে মানিয়ে গেছে বেশ, যার প্রমাণ ওপরের উদ্ধৃতিত্রয়। তিনটি উদ্ধৃতিতে কর্তার অবস্থান দেখা যাক: প্রথম ও তৃতীয় দৃষ্টান্তে কর্তা পদের শেষে বসেছে এবং দ্বিতীয় উদ্ধৃতির প্রথম পঙ্‌ক্তিটি কর্তাহীন। বাংলা বাক্য গঠনরীতিতে 'কি', 'কেবা' এ জাতীয় শব্দ বাক্যের প্রথমে অথবা শেষে বসে। কিন্তু এখানে এদের অবস্থান বাক্যের মধ্যপর্যায়ে। উদ্ধৃতিদ্বয়ে ক্রিয়ার পূর্বে বসে এ শব্দগুলো ভাষার বুননে ভিন্ন দ্যোতনা গড়ে তুললো। একটি বাক্যের অন্তর্গত পদবিন্যাসের মধ্যে প্রচলিত ব্যাকরণের সূত্রকে সাহসিকতার সঙ্গে অগ্রাহ্য করে যখন নতুন বিন্যাস নির্মাণ করা হয়, তখনই বাক্যটির বিশেষত্ব ধরা পড়ে। সেই সাহসিকতা ক্রিয়ার বিন্যাসেও সুপ্রত্যক্ষ: প্রথম দৃষ্টান্তে 'বলিব' ও হৈও' ক্রিয়াদ্বয়ের অবস্থান বাক্যের মধ্যপর্যায়ে; দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'শুনাইল' ও 'আকুল করিল' এর অবস্থান ভিন্ন। তৃতীয় দৃষ্টান্তে ক্রিয়ার ব্যবহার চমকপ্রদ। এর প্রথম বাক্য ক্রিয়াহীন। দ্বিতীয় বাক্যে মধ্যপর্যায়ে এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ বাক্যে শেষে বসেছে ক্রিয়া। অর্থাৎ ক্রিয়া কখনো কর্তার, কর্তা কখনো ক্রিয়ার জায়গা দখল করেছে। বাক্যবিন্যাসের হেরফের তাঁদের পরিপক্ব কবিত্বশক্তির নিদর্শন। তবে পদাবলির বাক্যরীতি ততটা সমৃদ্ধ নয়, যতটা সমৃদ্ধ এর রূপগত সংগঠন। বাক্যরীতির নতুন বিন্যাস ও সমৃদ্ধির জন্যে উনিশ শতকে বাংলা লিখিত গদ্যের উন্মেষ পর্ব পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হয়েছে বাঙালি সাহিত্য রসিকদের।

৩.৪ অন্ত্য-যুগের পদাবলির ধ্বনিবৈশিষ্ট্য

ভাষাতাত্ত্বিকেরা অন্ত্য-মধ্যবাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যেসব টেকস্টের আলোকে নির্ণয় করেন, বৈষ্ণব পদাবলি সেগুলোর অন্যতম। এ সময়ের পদাবলির ভাষার সঙ্গে আধুনিক বাংলার খুব একটা পার্থক্য দেখা যায়নি।

ক. 'আ' ধ্বনি লোপ পেয়ে 'অ'- এর প্রচলন (আন্তর → অন্তর, আকারণ → অকারণ, আনল → অনল) হয়েছে এ পর্যায়ে। এবং 'অ্যা' ধ্বনির সুস্পষ্টতা লাভ এ সময়ের ধ্বনিব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। —

প্রদত্ত শব্দ	ভাষিক সূত্র	IPA
নায়্যা (পদসংখ্যা ১৪০)	নায়্+ অ্যা	næee̯a
রয়্যা (পদসংখ্যা১০১)	রয়্+অ্যা	rɔee̯æ
করায্যাছি (পদসংখ্যা ৬১)	কর্+অ্যা+ছি	kɔræc^{h}ɪ
দেখ্যাছ (পদসংখ্যা ২৬৫)	দেখ্+ অ্যা+ছ	dek^{h}æc^{h}o

খ. এ সময়ে মহাপ্রাণ ধ্বনি সুনির্দিষ্ট হওয়ায় অল্পপ্রাণ ধ্বনির প্রচলন বেড়ে যায়। 'আহ্মে' (পদসংখ্যা ২৭), 'তোহ্মা' (পদসংখ্যা ২৭) প্রভৃতির পরিবর্তে 'তুমি' (পদসংখ্যা ৩১০, ৩১৬) 'আমি' (পদসংখ্যা ৩১০, ৩১২, ৩১৩), 'আমার' পদসংখ্যা ৩১২, ৩১৩), 'তোমার' (পদসংখ্যা ৩১২, ৩১৪)-এর ব্যবহার শুরু হয়। এর থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ভাষা ক্রমশ আধুনিক বৈশিষ্ট্যে সজ্জিত হচ্ছে।

গ. অপিনিহিতির প্রয়োগ আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যকে আরো সুস্পষ্ট করে তুললো: 'দেইখ্যা আইলাম তারে', কিংবা —

না যাইমু মুই মথুরার হাটে
নৌকা ফিরাইয়া দে।
মুই অভাগিনী নৌকাতে চড়িলুম
কানাইয়া ধরিল খেবা।
[নৌকা বিষয়ক পদ, পীর মোহাম্মদ[১] :
পদসংখ্যা ১৩৭]

ঘ. অপিনিহিতি কিংবা 'অ্যা' ধ্বনির সূত্রে পদাবলির ভাষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সংযুক্ত হলো: লৌকিকতা বা আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গিমা। এ বৈশিষ্ট্য পদাবলির ভাষায় প্রাণরস সঞ্চার করেছে। নিচের উদ্ধৃতিতে রাধা-কৃষ্ণের মান-অভিমান লৌকিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ধরা পড়েছে।—

আউলাইয়া মাথার কেশ কভু নাহি বান্ধে।
রাধা কানু অভিমানে গোপিনী সব কান্দে।...
সোনা নহে রূপা নহে আঞ্চলে বান্ধি থুইতুম

হৃদয়ের 'পরে থুইয়া বাঁশি রজনী গোঁয়াইতুম।
[মান বিষয়ক পদ, সৈয়দ মর্তুজা[২] : পদসংখ্যা ১৯৭]

ঙ. কখনো কখনো অর্থের সৌন্দর্যের সঙ্গে ধ্বনির সৌন্দর্যের যোগে এমন একটা রসায়ন প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে যে, অর্থই ধ্বনির সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে তা কাব্যসৌন্দর্যের ধারক হয়ে ওঠে। কখনো বা অর্থ আর ধ্বনির মধ্যে হৃদ্যতা নির্মিত হয়, যা ধ্বনি ও অর্থের বিচিত্র সৌন্দর্য-সম্ভাবনাকে প্রকটিত করে। —

মনের মরম কথা, সুন গো সজনি,
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী।
কোন্ বিহি সিরজিল কুলবতী বালা,
কেবা নাহি করে প্রেম, কার এত জ্বালা?
[অনুরাগ বিষয়ক পদ, জ্ঞানদাস : পদসংখ্যা ৬২]

এ উদ্ধৃতিতে জ্ঞানদাসের সরল ভাষা প্রয়োগ রাধার চপল হৃদয়ের সহজ ভাব প্রকাশিত হলো সাবলীলতার সঙ্গে। মনের সহজ ভাব এমন সরল ধ্বনিবিন্যাসে গ্রন্থনায় চণ্ডীদাসের মতো জ্ঞানদাসের প্রতিভাও উচ্চমার্গীয়।

৩.৫ অন্ত্য-মধ্যযুগের পদাবলির রূপবৈশিষ্ট্য

ক. 'ব্যাকরণগত লিঙ্গানুশাসনের অবলুপ্তি' (মজুমদার, ২০০৩ : ১১৫) ঘটে এবং অর্থতাত্ত্বিক প্রয়োগের প্রচলন শুরু হয় পদাবলিতে। পূর্বের স্তরের লিঙ্গ ও ক্রিয়ার মধ্যকার নির্ভরতার নিষ্পত্তি হলো এ পর্যায়ে। পূর্বস্তরের 'গেলি' হলো 'গেল', 'ভেলি' হলো 'ভেল'।

খ. প্রায় সব ক্ষেত্রে (বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়া) সংস্কৃতানুসারিতা হ্রাস পেয়ে আধুনিক ভাষারীতি ক্রমশ বিকশিত হচ্ছিল।

গ. ক্রিয়ার আধুনিক রূপের ব্যবহার করেন এ পর্যায়ের কবিগণ। যেমন:

প্রদত্ত শব্দ	ভাষিক সূত্র
বলে (পদসংখ্যা ২০৬)	বোলে
ছুঁওনা (পদসংখ্যা ১৯৪)	ছুয়ো না
শুন (পদসংখ্যা ৭৩)	শুনো
নিল (পদসংখ্যা ২৫৫)	নিলো

ঘ. যৌগিক ও মিশ্র ক্রিয়ার প্রয়োগও ছিল আধুনিক-ঘেঁষা। যেমন: 'ঘোষণা রহিল' (পদসংখ্যা ৬০), 'বুঝি গেল' (পদসংখ্যা ৬০), 'ধরি টানে' (পদসংখ্যা ১০৯), 'চলিল অভিসার' (পদসংখ্যা ১৫২), 'কহে গেল' (পদসংখ্যা ৩১৮), 'থুইয়া যাও' (পদসংখ্যা ১১০) ইত্যাদি। ক্রিয়ার এই বিবর্তন সম্বন্ধে সুখময়

মুখোপাধ্যায়ের (সুখময় ১৯৫৮) অভিমত — কোনো একটি মাত্র ক্রিয়াপদের বদলে একাধিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার অর্বাচীন সংস্কৃত থেকে অপভ্রংশ অবহট্‌ঠের মধ্য দিয়ে বাংলায় এসেছিল। অন্ত্য-মধ্যযুগের সাধু ভাষায় এই যৌগিক প্রয়োগ বহু তদ্ভব ধাতুকে সরিয়ে দিয়েছে (পৃ. ৫৫)।

ঙ. মুখ্য ও গৌণ কারকের প্রকৃত পার্থক্য ঘুচে গেল এখানে। কারকে অর্থতাত্ত্বিকতা ও বিভক্তির প্রয়োগ আধুনিক বাংলার অনুগামী। কারকে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তিতে 'কে' ও 'ক' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। 'ক' বিভক্তির প্রয়োগ ভাষার আঞ্চলিকতাকে নির্দেশ করে। পঞ্চমীতে ত/ তে এবং ষষ্ঠীতে র/ এর বিভক্তির প্রয়োগ আধুনিক বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। —

১. অন্তরে মদন কয়ল পরকাশ। [অভিসার বিষয়ক পদ, গোবিন্দদাস: ১৪১]
২. মন্দিরে যামিনী জাগি॥ [অভিসার বিষয়ক পদ, গোবিন্দদাস: ১৫০]
৩. নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চান্দা। [আত্মনিবেদন বিষয়ক পদ, জ্ঞানদাস: ৩১০]

চ. অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে সাধারণ বিভক্তি তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হতো — 'তুঁহি পুন বেণ' (পদসংখ্যা ৩৫), 'তুই যে অবলা নারী' (পদসংখ্যা ৮২), তুহুঁ যদি সুন্দরী (পদসংখ্যা ২১৪), তুহুঁ রহলি মধুপুর (পদসংখ্যা ২৫৩) প্রভৃতি।

৩.৬ *অন্ত্য-মধ্যবাংলার পদাবলির বাক্যিক বৈশিষ্ট্য*

অন্ত্য-মধ্যবাংলার পদাবলির পদবিন্যাস আধুনিক বাংলার মতন। —

ক. 'মাথায় পসার করি চলিয়াছে গোপালের নারী
কোথায় তোমার ঘর বাড়ি।
[দান বিষয়ক পদ, শেখচাঁদ[৩]: পদসংখ্যা ১৩০]

খ. সুন্দরি, আমারে কহিছ কি।
তোমার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
বিভোর হইয়াছি ॥...
তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া
গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
সদাই জাগয়ে মনে ॥
[আত্মনিবেদন বিষয়ক পদ, জ্ঞানদাস: পদসংখ্যা ৩১৮]

দৃষ্টান্তগুলোতে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার বিচিত্র বিন্যাস দেখা যাচ্ছে। ক্রিয়াপদ কখনো প্রথমে, কখনো পদমধ্যে, কখনোবা শেষে বসছে। উদ্ধৃতিদ্বয়ের পদবিন্যাসের ভিন্ন একটি তাৎপর্য নিহিত এর কথ্য ঢঙে। মোট কথা অন্ত্য–মধ্যবাংলার ধ্বনিবৈশিষ্ট্য-রূপবৈশিষ্ট্য-বাক্যিক বৈশিষ্ট্য প্রায়শই আধুনিক বাংলার অনুগামী।

৩.৭ *বৈষ্ণব পদাবলির ভাষায় মৈথিলির প্রভাব*

পদাবলির উল্লেখযোগ্য অংশ মৈথিলি ভাষায় রচিত হয়েছে। মিথিলার (উত্তর বিহার) কামেশ্বর রাজসভার কবি বিদ্যাপতির মাতৃভাষা ছিল মৈথিলি। ভিনদেশি এ ভাষাতেই বঙ্গীয় বৈষ্ণব রসধারা পরিবেশন করে তিনি বাঙালি কবিদের আদর্শস্থানীয় হয়ে আছেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে প্রাচীন মৈথিলি ভাষার পরিচয় হয় বিদ্যাপতির পদাবলি-সূত্রেই। সংস্কৃত, তৎসম ও মৈথিলি তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর মৈথিলি ভাষায় যে ভঙ্গরূপ পরিলক্ষিত হয়েছিল; বিদ্যাপতির ভাষায় তা-ই ধরা পড়েছে। যেমন: 'জোরহি'(পদসংখ্যা ৯৯) – যুক্ত করে, 'সুমিরি' (পদসংখ্যা ৯৯) – স্মরণ করে, 'অপএ' (পদসংখ্যা ৯৭) – অর্পণ করে, 'নিরদন্দা' (পদসংখ্যা ২৮৪) – নির্দ্বন্দ্ব, 'সিনেহ' (পদসংখ্যা ২৭৪) – স্নেহ, 'আনে' (পদসংখ্যা ১৯৬) – অন্যে প্রভৃতি। বিদ্যাপতির মৈথিলি ভাষার সঙ্গে বাংলা, অবহট্‌ঠ, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার সংমিশ্রণে বাংলা উড়িষ্যা ও আসামে পঞ্চদশ শতকের অন্ত্যভাগে এ ভাষার জন্ম হয়। ব্রজবুলি নামটি দেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। এ ভাষায় কবিতা লিখে সিদ্ধি লাভ করেন অসংখ্য কবি : গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর, বলরাম দাস, মুরারি গুপ্ত, লোচনদাস, বংশীদাস, যদুনন্দন, রামানন্দ, বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ। বিদ্যাপতির ভাষা প্রাচীন মৈথিলির রীতিসিদ্ধ এবং অপেক্ষাকৃত সরল। তবে গোবিন্দদাসের ভাষা সংস্কৃতঘেঁষা ও দীর্ঘসমাসযুক্ত। বিভিন্ন ভাষার মিশেলে চৈতন্যোত্তর কবি গোবিন্দদাসের পদাবলির কাঠামোটি গড়ে উঠেছে বলে ভাষার ইতিহাসে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।—

নখ-পদ হৃদয় তোহারি।
অন্তর জ্বলত হামারি॥
অধরহিঁ কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল॥...
অতয়ে চলহ নিজ বাস।
কহতহিঁ গোবিন্দ দাস॥

[মান বিষয়ক পদ, গোবিন্দদাস : পদসংখ্যা ২০৪]

কবি বিদ্যাপতির হাত ধরে এ ভাষার সঙ্গে বাঙালির সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে, যার চূড়ান্ত রূপ লক্ষ করা গেছে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক প্রয়াসে। পদাবলির অধিকাংশ কবি এ ভাষায় পদ রচনা করেন। ব্রজবুলির ভাষাবৈশিষ্ট্য পদাবলির ভাষায় বিশেষ মাত্রা যোজনা করেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

৩.৮ *পদাবলির বাগর্থ বৈশিষ্ট্য*

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মনির্ভর সাহিত্য পরিসরে বৈষ্ণব পদাবলি নিয়ে এলো ভিন্ন স্বাদ। বৈষ্ণব কবিগণ যেহেতু একটি ধর্মদর্শনের ছত্রছায়ায় থেকে ব্যক্তিগত তাগিদ থেকে কাব্য চর্চা করেন, তাই তাঁরা শব্দের অর্থের মধ্যে গূঢ়ার্থ রক্ষার প্রয়াস চালিয়েছেন। তবে সেসব গূঢ়ার্থ সাধারণ পাঠকের রস সম্ভোগের অন্তরায় হয়ে ওঠেনি কখনো। অন্ত্য-

মধ্যপর্বের কবিতাগুলি অনেকটাই আধুনিক হওয়ায় এর শব্দের বাগর্থ আধুনিক বাংলার অনুগামী। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে কৃতঋণ, শব্দের অর্থ পরিবর্তন, সমধর্মী ভাষার শব্দার্থ পরিবর্তন, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় শব্দার্থের অর্থ পরিবর্তন, শব্দের অর্থ পরিবর্তন-সংকোচন-সম্প্রসারণ প্রভৃতি ভাষার সৌকর্য বৃদ্ধিতে বেশ সহায়ক। বৈষ্ণব পদাবলির ভাষায় এ ধরনের প্রবণতা খুব একটা চোখে পড়ে না। তবে সময় ও সমাজের ও দর্শনের প্রভাব যে এর বাগর্থতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যতে সমুজ্জ্বল রয়েছে, এ কথা সুনিশ্চিতভাবেই বলা চলে। যেমন :

জ্ঞানদাস গোবিন্দের চরণে লোটায়॥

[বসন্ত হোলী রাস বিষয়ক পদ, জ্ঞানদাস: পদসংখ্যা ২২৯]

'গোবিন্দ' শব্দটি এখানে দ্ব্যর্থক: ক. কৃষ্ণ এবং খ. গোবিন্দদাস। গোবিন্দদাসের শিষ্য হিসেবে জ্ঞানদাস গুরুর চরণে লুটানোর বাসনা পোষণ (এ রকম আকাঙ্ক্ষার কথা বৈষ্ণব পদে নেই বললেই চলে), কিংবা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরম ভক্তি প্রদর্শন সূত্রেই এজাতীয় বাক্যের নির্মিত হয়েছে এমনটি অনুমান করা যেতে পারে। এই দ্বিবিধ চেতনার চিহ্নায়ক হিসেবে ওপরের চরণটি বিশ্লেষিত হলে এর শিল্পসৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। শব্দের মধ্যে এ রকম দ্বিবিধ দ্যোতনা তৈরি করে কবিরা তাঁদের অধ্যাত্মবোধের ব্যাপারটি আড়াল করতে সক্ষম হলেন। উপমা-উৎপ্রেক্ষার সফল প্রয়োগে তাঁরা অতুলনীয়। —

দুহুঁ দোহাঁ যৈছন দারিদ হেম।
নিতি নব নৌতুন নিতি নব প্রেম।

[মিলন বিষয়ক পদ, গোবিন্দদাস: পদসংখ্যা ১৭৬]

নিঃস্ব, দরিদ্রের নিকট স্বর্ণ যেমন রাধার নিকট কৃষ্ণের সাহচার্যও তেমনই দুর্লভ ও কাঙ্ক্ষিত। এখানে তুলনীয় বস্তু আমাদের চেনাজানা জগৎ থেকে গৃহীত। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে যে শিল্পবিশ্বাস প্রকাশ পেল, তা সীমিত অর্থে লৌকিক হলেও ব্যাপক অর্থে পারলৌকিক। কবিতার প্রসাধনী নির্মাণে এ রকম প্রয়োগ-বৈচিত্র্য লক্ষ করা যাবে পদাবলিতে। —

কদম তলে থাক কানু রে কদম্ব পুষ্প চাইয়া।
প্রাণি হরি নিলা শ্যাম বাঁশিটি বাজাইয়া॥
কদম তলে থাক কানু রে বাজাও মোহন বাঁশি।
বাঁশির স্বরে খসি পড়ে কাঁখের কলসি॥

[বংশী বিষয়ক পদ, সৈয়দ মর্তুজা : পদসংখ্যা ১০৭]

বাঁশি আমাদের লোকায়ত জীবনের উপাদান। কিন্তু তাতে সে-সুর বাজছে তা কেবল বিশ্বমানবের হৃদমুক্তির, হৃদ-ব্যাকুলতার কথা জানান দিচ্ছে। প্রেম ও সমর্পণের বার্তা নিয়ে বাঁশির সুর রাধাকে বিদিক করে। রাধার অস্তিত্বের জন্যেও তখন অনিবার্য হয়ে

পড়ে সেই বংশীবাদক। কিন্তু বাধা সমাজ-সংসার। বে-আকুল চিত্তে তাই শুরু হয় অন্তর্দহন। কবি সেই অন্তর্দহনের ছবি আঁকলেন আরেকটি লোকায়ত উপাদান ব্যবহার করে। কুমারের চুল্লিতে তীব্র উত্তাপে মৃত্তিকার ভস্ম হওয়ার মতোই ভেতরে ভেতরে রাধা-আত্মা পুড়ে অঙ্গারে পরিণত হচ্ছে। সভ্যতার উষা লগ্ন থেকেই নারীদের নিষ্পেষিত হওয়ার ইতিহাসের সূচনা। বাংলা সাহিত্যে সেই ইতিহাসের প্রথম সাক্ষী সম্ভবত রাধা। কেবল নিষ্পেষিত নারীই নয়, এর বিরুদ্ধে প্রথম বিরুদ্ধবাদী কণ্ঠস্বরও সে। অকপটে সে তার অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করছে। যদিও কবির ক্ষেত্রে লিঙ্গবাচক বিবেচনা সমীচীন নয়, তবুও একটি কথা পাঠকের চৈতন্যে জাগ্রত হয় যে, মধ্যযুগের একজন পুরুষ কবি রাধার নারীহৃদয়ের অন্তর্দাহ অন্তরের কতখানি গভীর তলদেশ থেকে অনুভব করলেন। সেই প্রগাঢ় বেদনার সহজ-সাবলীল-সুস্পষ্ট ভাষায় এবং চিত্রকল্পময় ভঙ্গিতে সেই প্রগাঢ় বেদনার অন্তর্বয়নে কবি অনেকবেশি আন্তরিকও বটে। আবার একজন কবি যখন বলে ওঠেন :

কেলি-কদম্ব মূলে ও না নব মেঘের কোড়া।
মেঘের উপরে চাঁদ তাঁহে দুটি কমল জোড়া॥
কিয়ে কমল দোলে নাটুয়া খঞ্জন পাখী।
মোর সর্বস্ব যৌবন দিয়ে শ্যামরূপ দেখি॥
[অনুরাগ বিষয়ক পদ, বলরাম দাস: পদসংখ্যা ২৬]

কবিরা যে কতটা 'রাধা ভাবে ভাবিত' ছিলেন- তা বুঝতে পাঠককে বেগ পেতে হয় না। কৃষ্ণসত্তায় পূর্ণরূপে সমর্পিতা রাধার অন্তর প্রদেশে কেবল কৃষ্ণ-চিহ্ন বিরাজিত। 'কদম্ব মূল', 'মেঘের কোড়া', 'মেঘের উপরে চাঁদ', 'খঞ্জন পাখি', 'দুটি কমল জোড়া' — এসব প্যারাডাইম মূলত শ্যামরূপেরই দ্যোতক। প্রকৃতির সহযোগে বৈষ্ণব পদ এভাবেই বিশিষ্ট মাত্রা পেল। কখনো রাধার, কখনো বা কৃষ্ণের রূপকল্প নির্মাণে প্রকৃতি বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। —

যাঁহা যাঁহা ভাঙ্গুর ভাঙু বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল॥...
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ-কুমুদ পরকাশ॥
[অনুরাগ বিষয়ক পদ, গোবিন্দদাস : পদসংখ্যা ৫২]

রাধার চঞ্চল ভ্রু-ভঙ্গিমা উচ্ছল যমুনার ঢেউয়ের সঙ্গে প্রতিতুলিত হলো। আর তার হাসিতে যেন পুষ্পের প্রকাশ – কবির অসামান্য কল্পনাশক্তিতে এ দুয়ের ভেদ মিলিয়ে গেল নিমেষেই। 'হ', 'ক', 'ল' ধ্বনির পুনরাবৃত্তিতে এক ধরনের গীতময়তা তৈরি হলো, তৈরি করলো চমৎকার একটি অনুপ্রাসের। শব্দগুলো কবির বিশেষ ভাবের অনুকূলে কাজ করেছে। মূলত ভাষার ব্যাকরণিক বিষয়ের উদ্দেশ্য হলো অর্থ তৈরি করা। এই অর্থ তৈরি করার বিষয়টি আরো বিস্তৃত ও সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণের জন্যে এর চিহ্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আবশ্যক।

৪. বৈষ্ণব পদাবলির বাগর্থ কাঠামোর চিহ্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

আধুনিক নন্দনতাত্ত্বিক গবেষণার পাশাপাশি ভাষাবিজ্ঞানের একটি বিশেষ দিক চিহ্নবিজ্ঞান (Semiotics)। কবিতা কিংবা যে-কোনো রচনার হয়ে-ওঠার প্রক্রিয়া অনুধাবনের একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে চিহ্নবিজ্ঞানকে বিবেচনা করা হয়। বিভিন্ন শিল্প-উপাদান পাঠকের বোধিতে যে অনুভাবন প্রক্রিয়া তথা সংবেদনশীলতার জন্ম দেয় ও চিহ্নবিজ্ঞান সেটিকে পাঠকৃতির (text) সঙ্গে অন্বয় নির্ণয়-পূর্বক চিহ্নের আশ্রয়ে পরিস্ফুট করে। এর মৌল প্রবণতা হলো জগৎ-সংসারের সবকিছুকে বিশিষ্ট সব চিহ্নের (sign) সাহায্যে তথা এর দ্যোতক (signifier) ও দ্যোতিত (signified)-এর সমন্বিত রূপের সাহায্যে প্রকটিত করা। মূলত 'semiotics... attempts to describe the evasive, ambiguous, paradoxical language of literature in a sober, unambiguous metalanguage'. (সূত্র: সমীরণ, ২০০৭ : ১৯৩)। মানুষের চিন্তাজগৎ অনবরত পরিবর্তিত হয়, সেই সঙ্গে পাল্টে যায় চিহ্নের দ্যোতকগুলোও। চিন্তা যেমন একটি থেকে আরেকটিতে সঞ্চালিত হয়, তেমনি দ্যোতকগুলোও একটি থেকে আরেকটির দিকে ধাবিত হয়। এ প্রক্রিয়া চলে নিরন্তর। দ্যোতক ও দ্যোতিত তাই বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পরের সম্পূরক। উল্লেখ্য যে, একটি চিহ্ন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে সংহিতার (code) মাধ্যমে। সংহিতা ব্যতীত একটি চিহ্ন চিহ্নের মর্যাদা লাভ করে না। দ্যোতক ও দ্যোতিতের সম্পর্কটি আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল বলেই চিহ্নের একটি প্রচলিত অর্থ নির্ধারণে সংহিতার বিকল্প নেই। সংহিতায়নের সূত্র অনুযায়ী চিহ্নগুলো সমাজ প্রতিবেশে সজ্জিত হয়। সমাজেদেহে প্রোথিত থাকে বিচিত্র চিহ্ন। এসব চিহ্ন বিধৃত হয় শিল্প-সাহিত্যে। চিহ্ন বা বস্তু তখন লাভ করে বিমূর্ত চেতনার ব্যঞ্জনা, রচিত হয় প্রতীকী সাহিত্য। তবে চিহ্ন ও সংহিতার বাস্তব রূপ লাভের ক্ষেত্র সংস্কৃতি-প্রতিবেশ (culture)। সংস্কৃতি-প্রতিবেশ চিহ্নের ধরন ও প্রয়োগের নির্ণায়ক। এক্ষেত্রে ওই সমাজের মনস্তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

পদাবলির কবিদের দেশ-কাল কিংবা সাহিত্যিক-মানস গড়ন ভিন্ন বলে ভাষারীতিতে এসেছে বৈচিত্র্য। মৈথিলি, খাঁটি বাংলা, আরবি-ফারসি, সংস্কৃত ও তৎকালের অন্যান্য ভাষান্তর দ্বারা প্রভাবিত বৈষ্ণব পদসাহিত্য। ভাষা যাই হোক না কেন, কবিরা আপন চেতনলোক মন্থন করে শব্দসজ্জার বিচিত্র বিন্যাসের আশ্রয়ে যে অনবদ্য কাব্যদেহ নির্মাণ করেন তা যেমন অতুলনীয়, তেমনি তাঁদের নিজস্ব চিহ্নায়ন কুশলতার স্মারক। ভিন্ন ভাষার কবি হয়েও ভাষাবিন্যাসের চাতুর্যে ও সামর্থ্যে বিদ্যাপতির মতো কবি হয়ে উঠলেন একেবারেই বাঙালির প্রাণের রসিক কবি। খাঁটি বাংলার সরল কাঠামোয় বৈষ্ণবীয় রসভাষ্য পরিবেশন করলেন বঙ্গীয় প্রতিভা চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস। তাঁদের কবিতায় কখনো বা তাত্ত্বিক অনুভূতি রূপায়িত হয় অসামান্য শৈল্পিক ব্যঞ্জনায়। ভাব ও ভাষাকে যথোপযুক্ত শব্দমালায় গ্রন্থিত করার ক্ষেত্রে তাঁদের জুড়ি নেই। হুমায়ুন আজাদের ভাষায় বলা চলে যে, ভাষার ওপর তাঁদের অধিকার ছিল বিধাতার মতো।

ফলত বৈষ্ণব কাব্য লাভ করে কবিতার এক সুসজ্জিত শরীর এবং আকর্ষণীয় ভাষা কাঠামো।

কৃষ্ণলীলা ও রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়গাথা ভারতীয় সমাজ-ইতিহাস ও পুরাণ বাহিত একটি সুপরিচিত অনুষঙ্গ। ইতিহাস-ঐতিহ্যবাহিত এ অনুষঙ্গ বৈষ্ণব পদের বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্যের বৈষ্ণবীয় অতীন্দ্রিয়বাদী অনুভাবনা এর মর্মমূলে সংপ্রোথিত থাকলেও প্রধান হয়ে উঠেছে মানব-মানবীর লৌকিক প্রেমগাথা। পদাবলিতে রাধা-কৃষ্ণের কামগন্ধহীন নিষ্কলুষ প্রেমের ছবি পাওয়া যায় না। লৌকিক এই প্রণয়গীতিতে নায়িকা 'রাই', নায়ক 'কালা'র রূপকল্পে কবিরা একটি সার্বজনীন আবহ নির্মাণ করলেন — যেখানে কাম ও প্রেম সমার্থ দ্যোতনার বাহক। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে প্রেম ও কাম — এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ ছিল না বললেই চলে। কৃষ্ণ-দয়িতা রাধার মানসভূমিতে সমীকৃত হলো একই চেতনায়। —

দেখি শ্যাম মোহনিয়া।
এ রূপ যৌবন করিয়া নিছন
রাঙ্গা পদে ভজ গিয়া ॥
মোহনিয়া কালা মোহনিয়া মালা
মোহনিয়া বাঁশি বাজাএ।
[অনুরাগ বিষয়ক পদ, মীর ফয়জুল্লাহ্[৪]: পদসংখ্যা ৬৭]

'শ্যাম', 'শ্যাম মোহনিয়া', 'কালা' কিংবা 'কালিয়া বন্ধু' — এসমস্তই কৃষ্ণের চিহ্নস্বরূপ। কবি কৃষ্ণ শব্দটি ব্যবহার করেননি। কেননা শ্যাম-কালা-কালিয়া শব্দের সরসতা, কোমলতা, মোহময়তা, প্রাণময়তা কৃষ্ণ নামে অনুপস্থিত। অসীম দ্যোতনা ও কাম্য বর্ণ বিচ্ছুরণের সঙ্গে শ্যাম বা কালা কবি-কল্পনায় হয়ে ওঠে সঙ্গতিপূর্ণ। বস্তুগত সীমানা অতিক্রম করে আরো গভীর অভিদ্যোতনার নির্মিতি কবির লক্ষ্য বলেই এ শব্দচিহ্ন ব্যবহার করলেন। 'কালো জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে/ নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে' — কৃষ্ণ বিরহিনী রাধার অঙ্গের অনিবার্য অংশ হয়ে উঠলো কৃষ্ণবর্ণ। এ বর্ণ কৃষ্ণেরই প্রতীক চিহ্ন। এ বর্ণ বঙ্গীয় জনসাধারণের দেহবর্ণের প্রতিরূপক যেন। অপরদিকে, কবির চেতনায় রাধার দেহবর্ণ ধরা দিল চাঁপা ফুলের বর্ণসৌষ্ঠবে।—

চম্পকদাম হেরি চিত অতি কম্পিত
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর
ধনি ধনি তোহোরি সোহাগ॥
[অনুরাগ বিষয়ক পদ, গোবিন্দদাস: পদসংখ্যা ৯৬]

চাঁপা ফুলের রঙিন বর্ণচেতনায় উদ্ভাসিত হলো বৃষভানু নন্দিনী রাধার রূপশ্রী। চাঁপা ফুলের মাদকতায় যেমন ভ্রমর আকৃষ্ট হয়, তেমনি রাধার রূপে বিমুগ্ধ কৃষ্ণেরও যাত্রা

রাধার দিকে। এটিই শেষপর্যন্ত কৃষ্ণের কাঙ্ক্ষিত বর্ণচেতনায় পরিণত হয়। চাঁপা ফুল প্রকৃতির একটি প্যারাডাইম, এটি রাধার দ্যোতক হিসেবে কাজ করেছে। চাঁপা ফুল রাধার প্রতীকচিহ্নে রূপান্বিত হলো কবি-কল্পনায়। এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, বস্তুবিশ্ব কবিতায় সরাসরি গ্রন্থিত হয়নি: বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতপূর্ণ উপস্থাপনা কিংবা চরিত্রের অন্তর্দেশ-সংলগ্ন চেতনার পরিস্ফুটনের সহায়ক প্যারাডাইম হিসেবে কবিতার শরীরে যোজিত হয়েছে। সমগ্র পদাবলির অন্যতম বিশিষ্টতা এটি। কানু-বিনোদিনী রাই যখন নিজের শরীরের আধারে খুঁজে পান কৃষ্ণের আস্বাদ, তখন কবি যে বহুমাত্রিক দ্যোতনা তৈরি করেন– তারও উপকরণ হিসেবে আবির্ভূত হলো প্রকৃতিলোকে।—

হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার ॥
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হম তুহু জানি ॥...
[ভাব-সম্মিলন বিষয়ক পদ, বিদ্যাপতি: পদসংখ্যা ২৮৬]

কৃষ্ণ-আকুল রাধার নিকট কৃষ্ণ-প্রেম প্রতিভাত হয়েছে তার অঙ্গের বিবিধ অলংকার আর প্রসাধনী হিসেবে। এ প্রেম একদিকে ইন্দ্রিয়বাদী, অন্যদিকে অ-ইন্দ্রিয়বাদী। 'দর্পণ', 'ফুল', 'অঞ্জন', 'তাম্বুল', 'মৃগমদ' 'পাখীক পাখি', 'মীনক পানি', 'জীবক জীবন'– সবই কৃষ্ণেরই দ্যোতক। ফুল, মীন, পাখি, জীব প্রভৃতি দ্যোতকসমূহ প্রাকৃতিক প্যারাডাইম এবং এগুলো একক ও স্বতন্ত্র অর্থের বাহক। লক্ষণীয় যে, দ্যোতক অনায়াসেই ছুটে চলেছে অন্য দ্যোতকের পানে। কিন্তু দ্যোতকগুলো শেষপর্যন্ত রাধার অনুরাগ সম্পূর্ণরূপে ধারণ করতে পারছে না যেন। নানা চিহ্নে চিহ্নায়িত করেও দয়িতের প্রকৃতস্বরূপ অনুধাবনে ব্যর্থ রাধা। সেই ব্যর্থতার অবসান ঘটালেন স্বয়ং কবি, নির্বিঘ্নে জানিয়ে দিলেন — 'দুহুঁ দোহা হোয়'। দুয়ের এক হওয়া — এটিই সমগ্র *বৈষ্ণব পদাবলির* প্রধান আকল্প হিসেবে কাজ করেছে; এ চিহ্ন-ই বৈষ্ণব পদাবলির প্রধান ভাবের ইঙ্গিতবহ। এখানে জীবাত্মা-পরমাত্মা তথা রাধা-কৃষ্ণ অভিন্ন চিহ্নে চিহ্নায়িত হলো কবি-ভাষ্যে। রাধা চরিত্রের আরেকটি বিশিষ্টতা লুক্কায়িত এখানে। পাখির মুক্তি নীলাকাশে, মৎসের স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত বিহার জলরাশিতে– মুক্তির এই চিত্রপটে রাধার বন্দিদশার দৃশ্যপট পাঠকের চৈতন্যে বৈপরীত্যসূচক দ্যোতনার জন্ম দেয়। মুক্ত পথের দিশা খুঁজে খুঁজে হয়রান রাধা সবশেষে উপলব্ধি করেন—

আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
তোরা নিসাড় হইয়া আয় লো সজনি
আঁধার পেরিয়ে আলা॥
[প্রেমতত্ত্ব বিষয়ক পদ, চণ্ডীদাস: পদসংখ্যা ২৯০]

মধ্যযুগীয় নারীদের অবরুদ্ধতার প্রতিরূপক রাধা। তার অবরুদ্ধতা যতটা না বাহ্যিক, তার চেয়ে অনেক বেশি হৃদয়বৃত্তিক। এই বন্দিত্বের বেড়াজাল অগ্রাহ্য করে রাধা মুক্তির পক্ষ নির্বাচন করে নিল। আর সেই পক্ষ হলো প্রেম: হৃদয়বৃত্তির মুক্তির প্রতীক চিহ্নে পরিণত হয়েছে সমগ্র পদাবলিতে। 'বাহির দুয়ার' 'আঁধার' সমাজের বন্দিত্ব এবং 'ভিতর দুয়ার' ও 'আলো' মানবের হৃদয়মুক্তির প্রতীকী চিহ্ন হিসেবে বিবেচনা করলে পাঠকৃতির ব্যাখ্যান আরো নান্দনিক হয়ে ওঠে। আলোর সন্ধানী রাধা কৃষ্ণপ্রেমে নিমজ্জিত থাকাতেই মুক্তির আস্বাদ পেয়েছে। সব মিলিয়ে জীবনমুক্তির প্রতীকী চিত্র উন্মোচিত হলো। স্বনির্বাচিত জীবন পরিচর্যার প্রত্নপ্রতিমা রাধা জানেন প্রিয়ের সঙ্গে জাগতিক পরিসরে প্রণয়-মিলন প্রায়শই প্রতিকূল। মিলনের চিহ্নায়ক হিসেবে অভিসারের সঙ্গে রাধাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন কবি গোবিন্দদাস।—

মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ- গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
কর-যুগে-নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির পয়ানক আশে।
অভিসার বিষয়ক পদ, গোবিন্দদাস: পদসংখ্যা ১৫০]

প্রেমজ মিলন এ বস্তুবিশ্বে ক্ষণস্থায়ী। সে-কারণে রাধার অবলম্বন কখনো অভিসার, কখনো ভাবসম্মিলন। অসীম ও অজানার ডাক শুনতে পেয়ে অভিসারের উদ্দেশে যাত্রা করছে রাধা: বিপুল পরিসরের দিকেই তার অভিযাত্রা ও গতিশীলতা এবং সেই যাত্রার গন্তব্য 'শ্যামরস সায়র'। অভিসার পর্যায়ের পদে —

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।...
নীল অলকাকুল অলিক হিলোলিত
নীল তিমির দলু গোই।
নীল নলিনী জনু শ্যাম রস সায়রে
লখই না পারই কোই॥
অভিসার বিষয়ক পদ, গোবিন্দদাস: পদসংখ্যা ১৫২]

খণ্ড খণ্ড চিত্র যোজনা গোবিন্দদাসের করায়ত্ত। টুকরো টুকরো চিত্রময় বর্ণনাগুলো একীভূত হয়ে গড়ে তুললো একটি অসামান্য চিত্রকল্প, যা অভিসারের দ্যোতক। ঘোর অন্ধকার রজনী, নীল রঙের প্রসাধন, অলংকার এবং নীল চিকুর ও নীল নিচোল — অভিসারের জন্যে এসব প্যারাডাইমে রাধা সজ্জিত হয়ে ছুটে চলেছেন দয়িতের পানে, তার কাঙ্ক্ষিত শ্যামরস-সায়রে। চিহ্নবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'শ্যাম-সায়র' চিহ্নটিকে দ্ব্যর্থক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে: এর একটি অর্থ কাকের চোখের ন্যায় কালো দিঘি; অন্য অর্থ কৃষ্ণের প্রেম রসের সাগর। আমরা জানি যে, রচনার ব্যাসকূট (paradox) এবং দ্ব্যর্থকতা বর্ণনা ও সমাধানের মধ্যেই চিহ্নবিজ্ঞানের সার্থকতা (সমীরণ ২০০৭ :

১৯৩)। প্রথম অর্থটিকে চূড়ান্ত ধরে নিলে দ্যোতকটি কেবল প্রাকৃতিক অন্ধকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। দ্বিতীয় অর্থটি বরং শিল্পমণ্ডিত ও তা বহু দ্যোতনা প্রকাশ করে। অন্ধকার রাত্রিকে যদি কৃষ্ণের প্রতীক-চিহ্ন বিবেচনা করা হয়, তবে সেই অন্ধকারে নীলে সজ্জিত নীলিম রাধা বিলীন হয়ে গেল। দয়িতকে ইন্দ্রিয়স্থ করতে রাধার চঞ্চল চিত্ত সদা গতিময় ও ব্যাকুল। পদাবলিতে রাধা তাই গতিচেতনার দ্যোতক। রাধার অন্তর্জগৎ গতিশীল, আর তাই গতি পেল তার নীল অলকরাশি, নীল নিচোল। ত্রিবিধ গতিশীলতা একত্র হয়ে আঁধার রাত্রিটিকেই গতিময় করে তুলল যেন। বস্তুজাগতিক প্রতিবেশ এখানে বস্তুবিশ্ব-অতিক্রমী বোধের সিনট্যাগম্যাটিক বিন্যাস পেল। পার্থিব জগতের মধ্যে নির্মিত হলো এক অপার্থিব রূপকল্প। আবার রাধার চৈতন্যে কখনো কখনো পার্থিব জগতের স্বাভাবিক রূপের ব্যত্যয় ঘটে, এক বস্তুরূপ তার নিকট অন্য কোনো বস্তুরূপ বলে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ রাধা স্বাভাবিক চৈতন্য হারিয়ে ফেলছে। —

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥

[আক্ষেপ বিষয়ক পদ, দ্বিজ চণ্ডীদাসঃ পদসংখ্যা ১২২]

উন্মাদিনী রাধার মানসিক বিপর্যস্ততার ভাবটিকে কবি টেনে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে চলেছেন। ঘর-বাহির, আপন-পর, দিবস-রজনী প্রভৃতি বিশ্বপ্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন প্যারাডাইম। ভিন্ন এসব প্যারাডাইমের মধ্যকার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিরহী রাইয়ের চৈতন্যে সংমিশ্রিত হয়ে গেল। এসব উপাদান রাইয়ের বিশ্ববিস্তারী বিরহচেতনার চিহ্নায়ক। লক্ষ করবার বিষয় হলো চরণসমূহের গড়ন ও পদসমূহ অভিন্ন, কেবল জায়গা অদল-বদল ঘটেছে। বক্তব্যে ভিন্নতা এসেছে এ জন্যেই এবং সেই সূত্রে পাল্টে গেছে রাধার জীবনের অস্তিত্বের ব্যাখ্যাও। না-পাওয়ার বেদনা আর পেয়ে মিলন বিহারেও হারাবার আশঙ্কা — এ দুয়ের মিশেলে রাধার অন্তর্দহন তীব্র থেকে তীব্রতর হলো।—

১. রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ-পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

[অনুরাগ বিষয়ক পদ, জ্ঞানদাস : পদসংখ্যা ৬১]

২. জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপতি ভেল।...
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে লাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল॥

[প্রেমতত্ত্ব বিষয়ক পদ, কবি বল্লভ : পদসংখ্যা ২৯১]

বস্তুর মূর্ত ও অ-মূর্ত রূপচেতনা আধুনিক কবিতার অন্যতম বিশেষত্ব। অনুভবের জগৎ ও ইন্দ্রিয়ের জগতের মিশেলে কখনো বস্তুজগতের বস্তুক কখনোবা নির্বস্তুক উপস্থাপনার মাধ্যমে চরিত্রের অন্তর্লোকের উন্মোচন করেন কবিরা বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে। এই কৌশল অবলম্বন করে বৈষ্ণব কবিরা রাধার অতৃপ্ত আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সন্ধানের প্রয়াস পেয়েছেন। এ চেতনায় উজ্জীবিত হয়েই রবীন্দ্রনাথ *মানসী* কাব্যের "নিষ্ফল কামনা" কবিতায় লিখেছিলেন — দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে/ খুঁজিতেছি কোথা তুমি, কোথা তুমি। অথবা *সোনার তরী* কাব্যের "বৈষ্ণবকবিতা"য় লিখেছিলেন — বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান/ রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?/ দয়িতকে একান্তে পেয়েও রাধা অশান্ত, অস্থির, উৎকণ্ঠিত। কেননা বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের মধ্যেও বৈষ্ণব কবি বেদনাই দেখতে পান। অতৃপ্তিজনিত হাহাকার তার সমস্ত অন্তরাত্মা জুড়ে। সেই অনাদি ব্যথার সুরের বীণায় লক্ষ যুগের মানব-মানবীর বিরহগাথা রচনা করে চলেছেন বৈষ্ণব কবি। রাধার ব্যথায় ব্যথিত কবি-হৃদয়। —

আ লো, রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা
বসিয়ে বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা ॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে
না চলে নয়ান তারা।
[অনুরাগ বিষয়ক পদ, চণ্ডীদাসঃ পদসংখ্যা ৫৯]

কৃষ্ণ-সত্তার প্রতি এক অনন্ত, অসীম আকর্ষণ অনুভব করেন উদাসিনী, উন্মাদিনী রাধা। অস্তিত্বের স্বরূপ অনুধাবনে প্রয়াসী রাধা মেঘপানে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। পদাবলিতে সে-ই একমাত্র সক্রিয় চরিত্র। সমাজ বিবর্তন ধারায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রান্তিক সমাজের পুরুষ অপেক্ষা সক্রিয় ও উন্মুক্ত চেতনা লালন করে নারীরা। রাধা সেই সমাজ থেকে উঠে আসা নারী প্রতিমা, সেই সমাজেরই চিহ্নায়ক সে। আর তাই হৃদয়ানুভূতির সুস্পষ্ট ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রকাশে স্বচ্ছন্দ রাধা। তাই সে দয়িতকে ইন্দ্রিয়ের অধীনস্থ করতে ব্যাকুল। সেই ব্যাকুলতা প্রকাশেও রাধা স্পষ্টভাষী ও চমৎকার। তার কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি কেবল প্রেমের নয়, তা যেন দেশকালহীন অনন্ত আকাঙ্ক্ষার প্রতীকচিহ্ন। রাধা-কৃষ্ণের অধ্যাত্ম জীবনের সঙ্গে একান্তভাবে অন্বিত প্রতীক্ষার প্রহরগুলো। শূন্যহৃদয়ের অনিকেত এই বোধ কখনো অনুভববেদ্যতার, কখনোবা চিত্রময়তার ঢঙে প্রকাশ পেয়েছে। —

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥...
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী

ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
[বিরহ বিষয়ক পদ, বিদ্যাপতি: পদসংখ্যা ২৪৯]

বর্ষাঋতুর দৃশ্যপটে কবি রাধা দেবীর বিচ্ছিন্নতাবোধের বেদনাকে মূর্ত করে তুললেন। বর্ষা বিশ্বপ্রকৃতির একটি প্যারাডাইম। সাহিত্যের সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ প্যারাডাইমটি বিচিত্র সিনট্যাগমাটিক রূপ লাভ করেছে। লক্ষণীয় বস্তুজাগতিক প্যারাডাইমসমূহ এখানে সচেতনভাবে নির্বাচন করলেন কবি। কবি-কল্পনায় এখানে বস্তুজগৎ চরিত্রের অন্তর্লোকের স্বরূপ উন্মোচনে অনুষঙ্গ হিসেবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। রাধার বিষাদময় মনোলৌকের আভাস প্রাকৃতিক উপকরণে ছড়িয়ে দেন বিদ্যাপতি। ভাদ্র মাসের বর্ষাস্নাত রজনীর ঘন অন্ধকারে ক্ষণিকের আলোক ছটা নিয়ে বিজুরিরেখার আবির্ভাবের মতন বিরহী রাধার অন্তর্দাহের ঘনঘোর তিমিরের অবসানের জন্যে কৃষ্ণের উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। 'এমনি দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়'— এ জাতীয় ভাবনা থেকে রাধা তার প্রবাসী কান্ত কৃষ্ণের জন্যে ব্যাকুল। অপরদিকে ময়ূর ব্যাঙ, ডাহুকী বর্ষাযাপনের আনন্দের দ্যোতক; বজ্রপাতের তালে তালে এরা মত্ত হয়ে উঠছে। এরই বিপরীতে রাধার অবস্থান। ফলে তার বিরহবোধ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হলো। বিরহের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে যেমন বর্ষা ঋতু, তেমনি মিলনের আনন্দধারা নিয়ে বসন্ত প্রতীকচিহ্নের আবির্ভাব ঘটেছে।—

শিশিরক অন্তরে আওয়ে বসন্ত।
ফুয়ল কুসুম সব কানন-অন্ত॥
শ্রীবৃন্দাবন পুলিনক রঙ্গ।
ভোরল মধুকর কুসুমক সঙ্গ॥
[বসন্ত হোলী-রাস বিষয়ক পদ, গোবিন্দদাস: পদসংখ্যা ২২৫]

কানন, কুসুম, বৃন্দাবন, মধুকর — প্রকৃতির খণ্ড খণ্ড প্যারাডাইমগুলো একত্রে বসন্তের সুখস্বপ্নের দ্যোতক হয়ে উঠেছে। কবির হৃদ্গত অনুভব ও উত্তাপের ফলে ধর্মীয় পরিবেশ ও পটভূমিকে অতিক্রম করে চিরন্তন আনন্দ-বেদনার হৃদয়-তীর্থে পরিণত হয়েছে বৃন্দাবন ও সেই-সূত্রে বৃন্দাবনের বসন্ত-উৎসব। বৃন্দাবনের স্থানিক ও কালিক পটভূমি বৈষ্ণব কাব্য আস্বাদনের পক্ষে কিছুটা প্রয়োজন সিদ্ধ ছিল। কিন্তু কবি-হৃদয়ে যখন তা ভাব-বৃন্দাবনের চিহ্নে রূপান্তরিত হয়, তখন পটভূমি ও পরিবেশ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কেননা, সেই নিত্য-বৃন্দাবনে চিরকালের মানুষের নিভৃত অন্তরভূমিতে। ব্যক্তি-হৃদয়ের বেদনা বিশ্ববেদনার দ্যোতনা লাভ করলো। রাধার আকুলতা, পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন প্রভৃতির রূপায়ণের কবিগণ এমন সব চিহ্ন ব্যবহার করেন প্রথমে ব্যক্তিক ও বস্তুক এবং পরবর্তীকালে বিশ্বমানবিক ও নির্বস্তক আবেদনের দ্যোতক হয়ে ওঠে। –

ওপার হইতে বাজাও বাঁশি এ-পার হইতে শুনি।
অভাগিয়া নারী হাম হে সাঁতার নাহি জানি॥
[বংশী বিষয়ক পদ, চাঁদ কাজী : পদসংখ্যা ১০৩]

বাঁশি পার্থিব, এর সুর ও সুর নিঃসৃত আহ্বান অপার্থিব। যমুনা ও এর দু'কূলও তা-ই। বাঁশির সুর অধ্যাত্মবোধের চিহ্নে রূপান্বিত হলো রাধার আন্তরচৈতন্যে। তাই সাংসারিক রাধার কাছে বাঁশির সুর বিষময় প্রতিপন্ন হলো। নব যৌবন, কদম্বের তল, যমুনার জলপ্রবাহ, কানুর মুখের হাসি, কোকিলের স্বর সবই রাধার শত্রু বলে গণ্য হলো। এসব প্যারাডাইম রাধাকে বিরহী করে তোলে। বিরহবোধের চরম পর্যায়ে উপনীত রাধা তাই সর্বত্র শ্যাম-চিহ্ন দেখে। কখনোবা প্রবল রূপমুগ্ধতায় রাধা-চিত্ত আন্দোলিত হয়।

ঢল ঢল কাঁচা— অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়
ঈসত হাসির তরঙ্গ-হিলোলে
মদন মূরুছা পায়...
মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে ॥
অনুরাগ বিষয়ক পদ, গোবিন্দদাস: পদসংখ্যা ২৫]

সৌন্দর্যের বর্ণনায় এক ধরনের কোমলতা ও মোহময়তা তৈরি করে। দেহের কঠিন অবয়ব ক্ষয়ে ক্ষয়ে রূপ যেন বিগলিত হয়ে ভেসে যাচ্ছে — এমনই একটি ভাবনা কবি যেন সঞ্চারিত করতে চাইলেন পাঠক-চিত্তে। এক্ষেত্রে কবির নির্ভর শব্দ ও পদবিন্যাসের চাতুর্য এবং একই যুক্তব্যঞ্জনের পুনরাবৃত্তি। '-ন্দ' যুক্তবর্ণের পুনঃপুন বিন্যাস ভাষায় ধ্বনিময়তা যোগান দিল, যার চূড়ান্ত নান্দনিকতায় অনুপ্রাস অলংকার নির্মিত হয়। উদ্ধৃতিটিতে উপমার মালাও কবি গেঁথে দিলেন সযতনে। চাঁদ ও চন্দনের গন্ধতুল্য ও মেঘের মতোন অঙ্গসৌষ্ঠবে শঙ্খতুল্য সুউচ্চ গ্রীবাদেশ এবং এর সঙ্গে হাতির সুদৃঢ় ও মনোহর পদচারণার প্রতিতুলনা মানিয়ে গেছে বেশ। চাঁদ, চন্দন, মেঘ, হাতির প্যারাডাইমে সামগ্রিকভাবে কৃষ্ণরূপ শিল্পিত আকার পেল। রাধার রূপাবয়ব নির্মিতিতেও এ জাতীয় শিল্পসচেতনতা লক্ষ করা যায়। কবিকল্পনায় রাধারূপ ফুটে উঠলো চিত্রকল্পের আশ্রয়ে —

সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব- তটীতে
পড়্যাছে চিকুর-রাশি।
কান্দিয়া আন্ধার কনক চান্দার
শরণ লইয়া আসি।
[অনুরাগ বিষয়ক পদ, চণ্ডীদাস: পদসংখ্যা ৪২]

রাধার স্নান-পরবর্তী দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতীকী উন্মোচনে কবি প্রাকৃতিক প্যারাডাইমের আশ্রয়প্রার্থী হলেন। সিক্ত কুন্তলরাশি রাধার নিতম্ব আড়াল করে রেখেছে। এ দৃশ্যপট কবি চৈতন্যে ভ্রমের জন্ম দেয়। কবির চেতনায় রাধার কেশ কালো অন্ধকার, আর নিতম্ব সোনালি চাঁদের রূপকল্পে ধরা দিচ্ছে। মনে হচ্ছে এলায়িত কেশবিন্যাস-সৃষ্ট অন্ধকার কেঁদে কেঁদে নিতম্বরূপী সোনালি চাঁদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছে। আবার কখনো রাধার সৌন্দর্যের প্রতীকচিহ্ন হিসেবে বিদ্যুৎ ছটার প্রয়োগসাফল্য লক্ষ করা গেছে। সন্ধ্যার আবছা আলোয় রাধিকার সৌন্দর্য কবিচৈতন্যে স্থিতি পেল এভাবে—

নব জলধর বিজুরি- রেহা
দন্দ পসারিয়া গেলি॥
[অনুরাগ বিষয়ক পদ, শ্রীকবিরঞ্জন: পদসংখ্যা ৪৭]

বিজুরির আবির্ভাবে নববর্ষার সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে, গোধূলির দৃশ্যপটে রাধারূপও অনুরূপ। মূলত 'বিদ্যুৎ' ও 'মেঘ' যথাক্রমে তার গৌর অঙ্গ ও নীল বসনের দ্যোতক। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'মেঘ' কৃষ্ণের দ্যোতক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পদাবলিতে উভয়ের দ্যোতক 'মেঘ'। জীবাত্মা-পরমাত্মা বিষয়ক তত্ত্বমতে রাধা-কৃষ্ণ ভিন্ন আবার অভিন্ন। তাই তাদের দ্যোতকও কখনো এক, কখনো বা ভিন্ন। 'মেঘ'-এর দ্বিবিধ প্রয়োগে এ চেতনাই দ্যোতিত হলো। কখনো বা দ্যোতক ভিন্ন হলেও তা একই চেতনায় দ্যোতিত হয়ে ওঠে।—

না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে॥
সেই ত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে যেন রয়॥
[বিরহ বিষয়ক পদ, বিদ্যাপতি: পদসংখ্যা ২৭১]

জীবাত্মা-পরমাত্মার একই সত্তায় লীন হওয়ার মাধ্যম তমাল বৃক্ষ। প্রেমানুরাগের প্রথম পর্যায়ে রাধার কাঙ্ক্ষিত কৃষ্ণবর্ণ, বিরহের দশম দশায়ও সেই বর্ণই তার একান্ত আরাধ্য। তাই তমাল তরু ও কৃষ্ণবর্ণ ব্যাপক অর্থে রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুভূতিকেই দ্যোতিত করে। 'মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে' — আপন স্বভাবগুণে এ চরণ বাঙালির লোকজীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে গেল। লোক জীবনানুষঙ্গী বিচিত্র চিহ্নও ব্যবহৃত হয়েছে, যা পদাবলির ভাষায় ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। যেমন: কথ্য ঢঙের প্রয়োগ —

'গোঠে আমি যাব মাগো, গোঠে আমি যাব
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরী চরাব॥
চূড়া বান্ধি দে গো, মা, মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়াঞা রাজপথে॥
[শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক পদ, বলরাম দাস: পদসংখ্যা ১৯]

আবার পদাবলির কোনো কোনো চরণ প্রবাদ- প্রবচনের মর্যাদা লাভ করে। যেমন: 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু/ আনলে পুড়িয়া গেল' (পদসংখ্যা ১২৪)/ কিংবা 'সই, কে বলে পিরীতি বলে ভাল/ হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া/ কান্দিতে জনম গেল' (পদসংখ্যা ১১৪), গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।/ ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥ (পদসংখ্যা ৮৪)। কালক্রমে পদগুলোর শব্দের হয়তো একটু অদলবদল ঘটেছে, তবে এজাতীয় প্রবাদপ্রতিম বাক্য আজও প্রচলিত। আর এর মূলে কাজ করেছে এর ভাষার যুগাতিক্রমী শক্তি ও সৌকর্য। এর আরেকটি দৃষ্টান্ত —

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।...
যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই।
[অনুরাগ বিষয়ক পদ, গোবিন্দদাস: পদসংখ্যা ৫২]

এখানে প্রথম চরণের প্রথম 'তনু' শব্দের অর্থ ঋজু; দ্বিতীয় 'তনু'-র অর্থ অঙ্গ বা দেহ। একইভাবে দ্বিতীয় চরণের 'চল' ও 'চলই'-এর অর্থ যথাক্রমে চঞ্চল ও চলে যায়। পাশাপাশি একই শব্দ প্রয়োগ করে ভিন্নধর্মী অর্থদ্যোতনা সৃজনে গোবিন্দদাসের প্রখর কবিত্ব শক্তির পরিচয় মেলে।

৫. উপসংহার

আজ অবধি বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালির চৈতন্যে *বৈষ্ণব পদাবলি*র যে বিশেষ মূল্যমান নিরূপিত হয়েছে — তার অন্যতম প্রান্ত হলো এর ভাষা। *ভাষা দেশ কাল* গ্রন্থে পবিত্র সরকার 'প্রশস্ত ভাষা ভাণ্ডার' বা 'Linguistic Repartoire' প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, যা মূলত ভাষার নানা বৈচিত্র্য ও ভঙ্গিমাকে নির্দেশ করে। এ প্রত্যয়টি পদাবলির ভাষার ক্ষেত্রেও একান্তভাবে প্রাসঙ্গিক। কবির ব্যক্তি-হৃদয় ও অনুভূতির বেদনাময় উদ্ভাসনে, নিজস্ব কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণে, আপন ছন্দোলীলায়, চিত্র ও সংগীতের সারথ্যে ও সমন্বয়ে পদাবলির কবিভাষা ঋদ্ধ। শেষাবধি এর ভাষা রূপান্তরিত হয় চিরকালের ভাষা-অনুষঙ্গে। কালের সীমা ভেঙে ভাষা একটি সাধারণ মুহূর্তকে অনন্ত অসাধারণ মুহূর্তে রূপান্বিত করে নিল — পদাবলির ভাষা প্রসঙ্গে আলোকপাত শেষে এ বোধেরই জন্ম দেয়। বৈষ্ণব কবির ভাষায় চিরকালের সেই সুরই ধ্বনিত হলো। গীতল, তরল, মূর্ত-বিমূর্ত, ধ্বনিময়, প্রতীকী, চিত্র ও চিত্রকল্পময় ভাষার মিথস্ক্রিয়ায় পদাবলির ভাষা পরিমার্জিত ও শিল্পসফল। এর ভাষার সৌন্দর্যই রাধা-কৃষ্ণকে প্রেম ও সৌন্দর্যের চিহ্নায়ক হিসেবে পরিচিতি প্রদান করল। তাই বৈষ্ণব পদাবলি যুগ অতিক্রান্ত হলেও রাধা-কৃষ্ণ আমাদের সাহিত্যের অন্যতম প্যারাডাইম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের *ব্রজাঙ্গনা* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী* প্রভৃতি ছাড়াও বাংলা সাহিত্যে বিচিত্ররূপে রাধা-কৃষ্ণ চর্চিত ও চিহ্নায়িত হয়েছে। এ চর্চা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলবে এমনটাই প্রত্যাশিত।

টীকা

১. বৈষ্ণব পদাবলির একজন মুসলিম কবি। তাঁর পরিচয় এখনো ইতিহাসবেত্তাদের নিকট অজ্ঞাত। অনুমান করা হয় যে তিনি আঠার শতকের কবি ছিলেন।

২. কবি সৈয়দ মর্তুজা সম্ভবত সতের শতকের লোক। তাঁর পিতৃভূমি বেরিলী। তাঁর পিতা সৈয়দ হাসনাই সম্ভবত মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর এলাকার বলিয়াঘাটায় রাস করতেন বলে আহমদ শরীফ *মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন। এ স্থানেই কবির জন্ম বলে লোকশ্রুতি আছে। মর্তুজা সাধক ছিলেন। তাঁর পিরের নাম সৈয়দ আবদুর রজ্জাক শাহ। আনন্দময়ী নামে তাঁর এক ভৈরবী সাধিকা ছিলেন। ভৈরবী তাঁর সাধন সঙ্গিনী ছিল এবং তাঁরা দুজনে একত্রে 'মর্তুজানন্দ' হিসেবে পরিচিত ছিল বলে জানা যায়।

৩. শেখচাঁদ একজন কবি ও সাধক। তিনি শেখচান্দ নামেও পরিচিত। তিনি সাধক পির শাহদৌলার সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। ত্রিপুরা জেলার বাকসার গ্রামে তাঁর দরগাহ রয়েছে বলে জানা যায়। বেশ কয়েকটি গ্রন্থও লিখেছেন: *রসুল বিজয়*, *তালিম নামা বা শাহদৌলা পীর*, *কেয়ামত নামা* ও *হরগৌরী সংবাদ* প্রভৃতি।

৪. ধারণা করা হয় তিনি ষোল শতকের মধ্যবর্তী সময়ের কবি। তাঁর নামের নানা ভণিতা পাওয়া গেছে; যেমন: মীর ফয়জুল্লাহ, মীর্জা ফয়জুল্লাহ, শেখ ফয়জুল্লাহ প্রভৃতি। ফলে চণ্ডীদাস-সমস্যার মতো একটা জটিলতা তৈরি হয়। এ বিষয়ে ড. আহমদ শরীফ *মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য* নামক গ্রন্থে বলেন: শেখ ফয়জুল্লাহ ও মীর ফয়জুল্লাহ ভিন্ন বা অভিন্ন ব্যক্তি হতে পারেন। তিনি মনে করেন সম্ভবত লিপিকর প্রমাদের কারণেই এমনটি ঘটেছে। তবে তিনি বৈষ্ণব পদাবলির পদকর্তা হিসেবে মীর ফয়জুল্লাহর কথা বলেন।

৫. তাঁর পরিচয় অজ্ঞাত। চৈতন্যদেবের সময়ে তিনি নদীয়ার কাজী ছিলেন বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। কিন্তু দীনেশ চন্দ্র সেন মনে করেন নদীয়ার উক্ত কাজীর নাম ছিল গৌরাই কাজী, চাঁদ কাজী নয়। মুসলিম শাসনের ছত্রছায়ায় ছিলেন বলেই হয়তো প্রথম দিকে শ্রীচৈতন্যের নবধর্মের প্রতি কিছুটা বিরাগভাজন ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি চৈতন্যদেবের নবধর্মমতের প্রতি বিশেষ আস্থাশীল হন এবং সে-ধর্মমত প্রচারে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন বলে জানা যায়।

তথ্যপঞ্জি

অভিজিৎ মজুমদার। (২০০৭)। *শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

পরেশচন্দ্র মজুমদার। (২০০৩)। *বাঙলা ভাষা পরিক্রমা* (২ খণ্ড), কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং (দে'জ পরিবর্ধিত সংস্করণ)।

বুদ্ধদেব বসু। (২০১৪)। "ভাষা, কবিতা ও মনুষ্যত্ব", *বুদ্ধদেব বসু নির্বাচিত প্রবন্ধসমগ্র*, বেগম আকতার কামাল সম্পাদিত, ঢাকা: অবসর।

মাসুদুজ্জামান। (২০১৪)। "দেরিদার অবিনির্মাণ বিশেষ নির্মাণ নাকি তত্ত্বের অশরীরী নির্মিতি?", *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, বেগম আকতার কামাল (সম্পা:) ঢাকা: অবসর।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও ডক্টর আহমদ শরীফ (সম্পাদিত)। (২০১৩ দ্বাদশ মুদ্রণ), *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স। (বর্তমান লেখায় উদ্ধৃত পদসমূহ এ গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে।)

সুখময় মুখোপাধ্যায়। (১৯৫৮)। *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম*, কলকাতা: মিত্র এন্ড ঘোষ।

হুমায়ুন আজাদ। (বা. ১৪১৬)। *লাল নীল দীপাবলী বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী*, ২য় মুদ্রণ ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।